নিত্যসিদ্ধ মহাত্মার দিব্যদর্শনে—শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা

শ্রীবিষ্ণুপদ সিদ্ধান্ত ঠাকুর

(৬)

মানব প্রকৃতির মাঝেই বিশ্বপ্রকৃতি লুকিয়ে আছে; অনন্ত আকাশের মাঝে যেমন অনন্ত চাঁদ লুকিয়ে থাকে এবং নিঝুম

নিরালা রাতের মাঝেই তা' বেশী প্রকাশ পায়, মানবাত্মার নীরব স্থিতিতে তেমনি পরমাত্মার মিলন ঘটে। এই নীরব পূজাকেই আমরা সাধনা বলি। নিরালা পূজায় মানব প্রকৃতি জেগে ওঠে। সূর্য্য উঠলে, সুপ্ত মানুষ ও জীব-জগৎ যেমন জেগে ওঠে এবং স্ব স্ব কর্ম্মে নিযুক্ত হয়, নির্জ্জন ও নিরালা আরাধনায়, মানব প্রকৃতিও তেমনি জেগে ওঠে এবং বিশ্বপ্রকৃতির সাথে একে একে মিলন হতে থাকে; একেই সাধনা বলে। অন্তরের এক একটি প্রকৃতি যখন বাহির প্রকৃতির সাথে এক হয়ে যায়, তখন মানব অজ্ঞান হয়ে যায় বা জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ধ্যান ধারণায় মানবের দেহস্থিত এক এক অঙ্গের এক এক প্রকৃতি, বহির্জগতের এক এক প্রকৃতির সঙ্গে যতই মিশে যেতে থাকে, ততই সে জড়ত্ব পেতে থাকে বা জড় সমাধির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

রামকৃষ্ণদেবের আত্মা অনন্তের সাথে বিলীন হয়ে যেত, তারই প্রতীক ছবি হিসাবে আমরা তাঁর দক্ষিণ হস্তকে সেই অনন্তের দিকে প্রসারিত দেখি। কিন্তু যিনি এই অনন্তের পানে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে আবার মাটির জগতে ফিরে আসেন, কেবল তাঁরই বামহস্ত বুকের মাঝে ন্যস্ত থাকে বা হাত মুঠো হয়েও তাঁর তিনটে আঙ্গুল খোলা থাকে।

সাধকগণ এই অবস্থা প্রাপ্তিকে ''ওঁ'' মন্ত্রের পূর্ণ জাগরণ বলেন। ''ওঁ'' মন্ত্রে যেমন তিনটে ব্রহ্মধ্বনি যথা অ, উ, ম লুকিয়ে আছে, মানবাত্মার মাঝেও তেমনি স্বত্ত্ব, রজঃ, তম, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল বা সৃষ্টি, স্থিতি, লয় রূপ বিরাজিত থাকে। আত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনে এই তিন ব্রহ্মধ্বনি জেগে ওঠে; তারই প্রতীক ছবি আমরা রামকৃষ্ণদেবের দক্ষিণ বা বাম হস্তে দেখতে পাই। এই ''অ'' ধ্বনিকে বলে অশরীরী; ''উ'' ধ্বনিকে বলে উতরোল এবং ''ম'' ধ্বনিকে বলে ''মন্দিরে''। ওঁ মন্ত্রের জাগরণে বা আত্মার জাগরণকেই বলে— ''অশরীরী উতরোল মন্দিরে''। আকাশের মেঘ কেটেছে, সূর্য্য উঠেছে।

এই ওঁ মন্ত্রের সাথে বা আত্মার সাথে যে আরও নয়টি প্রকৃতি সুপ্ত থাকে তাদেরই নাম মন্ত্রকে বলে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, তৎসবিতুর্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য, ধীমহি, ধীয়োয়ো নঃ এবং প্রচোদয়াৎ অর্থাৎ কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, ও কমলা। এই দশমহাবিদ্যা, দশদিক বা দশটি গ্রহের নামও আমাদের আত্মার জাগরণে জাগ্রত হয়ে ওঠে। দশ দিকের বিশ্বপ্রকৃতি নিজ শরীরের দশ অঙ্গ সেই বিশ্বপ্রকৃতির আলোকে আলোকিত হয়ে ওঠে। আলোর সাথে আলোর মিলন হলেই, যাকে আমরা স্থূলদেহ বলি, সে পড়ে থাকে। রামকৃষ্ণদেবও তাই এখানে সেই দশ দিকের আলো-প্রকৃতির সাথে নিজ শরীরের দশটি অঙ্গ, যথা-হাত, মুখ, নাক, চোখ, কান, বুক, পেট, মাথা ও পা—পিঠের সঙ্গে মিলন দিয়ে, সেই এক শক্তিতে লীন হয়ে গেছেন। আলোর সাথে আলো মিশে গেছে।

এই ভাব-সমাধি অবস্থা থেকে ফিরে এলে, মানব প্রকৃতি এত প্রেমবিহ্বল হয়ে ওঠে যে, এই অবস্থায় তাঁর সবাইকে ''হরি'' বলে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করে। এই অবস্থায় রামকৃষ্ণদেবের অন্তরাত্মা বিশ্বপ্রকৃতির সাথে একীভূত হয়ে যেতো। সমস্ত বিশ্বের মাঝে, তিনি নিজের ছবি দেখতে পেতেন, তাই তাদের সকলকেই নিজেরই অঙ্গ বলে ভালবাসতে পারতেন। একেই বলা হয়, বিশ্বপ্রেমিক, বিশ্বপ্রকৃতি বা সেই রাধাশক্তি নামধারী আদি-জননী। তিনি নিজের মাঝে আদ্যামাকে দর্শন করতেন এবং তাঁরই প্রতিবিম্ব, প্রতি নরনারী এমন কি প্রতি জড় বা জীবের মাঝেও সন্দর্শন করতেন; এইহেতু সমস্ত সৃষ্টিকেই তিনি ''মা'' বলে সম্বোধন করতে পারতেন।

এমনি নেশার ঘোরে, তিনি প্রায় চব্বিশ ঘন্টাই অতিবাহিত করতেন; কিন্তু ঐরূপ সমাধিভঙ্গের পর, যে সব কথা কইতেন, তা শুনে মনে হত বিশ্বজননী নিজেই যেন কথা কইছেন। যেমন এই অবস্থার পর একদিন সামনে বিবেকানন্দকে দেখতে পেয়ে বলছেন—''মা! তুই ছলনা করে, এমন ভাবে ঘোমটা দিয়ে আছিস কেন? এই বুঝি তোর মায়ার ঢাকনি?''— এই বলতে বলতে তিনি বিবেকানন্দের পায়ে আছাড় খেয়ে পড়লেন— বিবেকানন্দের চোখেও সেদিন, এত অশ্রুপ্লাবন দেখা দিয়েছিল

যে, তিনিও যেন মূর্চ্ছিত বা পূর্ণ ধ্যানস্থ হয়ে প্রায় এক ঘন্টা যাবৎ মূঢ়বৎ বসে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন।

বাস্তব জগতের সাথে, মেলামেশার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কথাবার্ত্তাও কিছু বদলে যেতো এবং পারিপার্শ্বিক আত্মার সাথে নিজের আত্মার বিনিময় যোগ হত, তাই তিনি একদিকে যেমন বলে উঠেছেন—''পাঁকাল মাছের মত সংসারে বাস করতে হয়, যাতে গায়ে না পাঁক লাগে,'' অন্য সময় আবার বলছেন— ''কামিনী কাঞ্চনও যে, সেই আমার মা ভবতারিণী, তাঁকে কি ত্যাগ করা যায়? মা-ই এসব মোড় ঘুরিয়ে দেন।''

জীবজগতের সঙ্গে যুক্তভাবে একজনকে যেমন উপদেশ দিচ্ছেন—''গুরুনিন্দা শুনে, চুপ করে চ'লে এলি?'' আবার অন্যজনকে বলছেন—''গুরুনিন্দা করেছে বা শুনেছে ত, তোর কী?''

গৃহভেদে যেমন সূর্য্যের আলো একইভাবে উজ্জ্বল হয় না, আধার ভেদে অবতার অঙ্গও সেইরূপ রূপ বদলায়; সুতরাং কণ্ঠধ্বনি বা মুখনিঃসৃত বাক্যের ভেদও লক্ষিত হয়। অনন্ত সাগরের জল যে পাত্রে রাখা যায়, সেই পাত্রেরই যেমন আকার ধারণ করে, পরমব্রহ্মের রূপও তেমনি মানবাত্মার সঙ্গে যুক্ত হয়ে, মানবাত্মারই মনের কথা ক'য়ে যান, তাই তাঁর আরেক নাম ''অন্তর্যামী''।

রামকৃষ্ণদেব এই শক্তিরই প্রকাশ স্বরূপ, একদিন তাই স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করছেন—''তুই নিরালা ঘরে বসে পুঁথি পড়তে পড়তে হঠাৎ আমায় দেখে কাঁদছিলি কেন? কই এখানে ত আমায় দেখে অত কাঁদিস না?—বলত, তুই তবে কাকে দেখিস?— আমাকে? — না—মাকে?''

নরেন কেঁদে উঠে বলতে লাগলেন—''আমি, তোমার মাকে এখনও দেখি নি, কেবল তোমায় দেখি, আর তোমাকেই চিনি।''

...ক্রমশঃ

গীতা ভাবনা

(৪)

আমরা আগেই বলেছি যে শ্রীকৃষ্ণের মুখনিঃসৃত গীতার বাণীকে মহাভারতের মূল অংশ হিসাবে যেমন অনেকে মেনে নিয়েছেন তেমনি একদল পণ্ডিত এই মতকে খণ্ডন করেছেন। কারো মতে গীতা একটি প্রাচীন বা অর্বাচীন উপনিষদ্ অথবা ভাগবৎ দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের সংকলন। পরবর্তীকালে ভাগবৎ সম্প্রদায়ের দ্বারা এই গ্রন্থটি মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে কিথ্ (Keith) সাহেব মনে করেন শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ যেমন যোগপন্থী শৈবদের রচনা তেমনি গীতাও প্রাচীন উপনিষদ্। পরবর্তীকালে কৃষ্ণের ধর্মতত্ত্বের দ্বারা এটি প্রভাবিত। Holtzman মনে করেন যে বেদান্তদর্শনের অনুসরণে একেশ্বরবাদতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করার মানসিকতা থেকে কোন ব্যক্তি প্রাচীনকালেই গীতা রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব ধর্মসম্প্রদায়ের দ্বারা গ্রন্থটি পরিমার্জিত হয়। বর্তমানে প্রচলিত গীতায় ভাগবৎধর্ম ও ব্যূহবাদের ইঙ্গিত আছে। সেইসব তথ্যের পর্যালোচনা করে Garbe সাহেব মনে করেছেন ভাগবৎ ধর্মের তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে প্রাচীন ভক্তিকাব্যরূপে গীতা লেখা হয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে বেদান্তপ্রভাবিত ব্রাহ্মণ্য আদর্শে গ্রন্থটি সংশোধিত হয়। Hopkins আবার মনে করেছেন যে স্বতন্ত্র একটি উপনিষদ্ হিসাবেই গীতা রচিত হয়েছিল কিন্তু পরে তার প্রকৃতরূপটি নষ্ট হয়ে যায় এবং ভাগবৎ ধর্মতত্ত্বের দ্বারা তা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। যেভাবেই গীতার পূর্বরূপ এবং পররূপকে কল্পনা করা হোক না কেন গীতা সম্ভবতঃ বৌদ্ধযুগের পূর্বেই রচিত হয়েছিল এর কারণ হিসাবে পণ্ডিতেরা বলেছেন যে — বৌদ্ধদর্শনের কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব গীতায় নেই। বৌদ্ধযুগের পরে রচিত হলে এতবড় বৌদ্ধ প্রভাবকে এড়িয়ে যাওয়া হয়তো সম্ভব হত না।

প্রক্ষিপ্তবাদীরা মনে করেন মহাভারতের এই বিশালযুদ্ধের প্রাক্কালে উভয়পক্ষের সৈন্যদলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অর্জুনকে যে বিশাল তত্ত্বোপদেশ দেওয়া হয়েছে আঠারটি অধ্যায় জুড়ে, তার প্রাসঙ্গিকতা কতটা? যুদ্ধের প্রাক্কালে অর্জুনের মত বীর বীররসে উন্মত্ত হয়ে উঠবেন এবং শত্রুধ্বংসের উদগ্রবাসনায় চঞ্চল হবেন এটাই স্বাভাবিক। তার পক্ষে এত দীর্ঘ সময় ধরে এই তত্ত্বোপদেশ শ্রবণের ও মননের অবকাশ কোথায়? তাই গীতার এরূপ উপস্থাপনা বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গত হয় না। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব প্রতিপাদনের আঙ্গিক অবশ্যই অভিনব। মহাভারতে অবশ্য মূল কাহিনীর সঙ্গে এরূপ অপ্রাসঙ্গিক দীর্ঘ বিষয়ের উপস্থাপনা আরো অনেক পরিলক্ষিত হয়।

...ক্রমশঃ

—অধ্যাপক ডক্টর উদয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়